بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ ডিসেম্বর ২০২২ মোতাবেক ০২ ফাতাহ ১৪০১ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় মানুষের মাঝে তাঁর সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় হওয়ার ব্যাপারে লিখিত আছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আমরা মানুষের মাঝে একজনকে আরেকজনের চেয়ে উত্তম আখ্যা দিতাম। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা হতো যে, কে অপরের চেয়ে উত্তম। আর তখন (আমরা) মনে করতাম, হযরত আবু বকর (রা.) সবার চেয়ে উত্তম। এরপর (হলেন) হযরত উমর বিন খাত্তাব আর তারপর হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর মানুষের মধ্যের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি! অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রশংসা করেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যদি একথা বল তাহলে (শোন!) মহানবী (সা.)-কে আমি একথা বলতে শুনেছি যে, এমন কোনো মানুষের জন্য সূর্য উদিত হয় নি যে উমরের চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বলেন, আমাকে তুমি অন্যের চেয়ে উত্তম বলছ, অথচ আমি তো তোমার সম্পর্কেও মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি যে, তুমি উত্তম।

আব্দুল্লাহ্ বিন শফীক বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে জানতে চাই, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)। আমি জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.)। আমি বলি, এরপর কে? তিনি বলেন, এরপর হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.)। তিনি বলেন, আমি পুনরায় জানতে চাই, এরপর কে? তখন তিনি নিশ্চুপ থাকেন।

মুহাম্মদ বিন সিরীন (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)'র সমালোচনা করে, অর্থাৎ তাঁদের মাঝে দোষত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করে, আমি মনে করি না যে, সে মহানবী (সা.)-কেও ভালোবাসে। অর্থাৎ একই সাথে এই দাবিও করে যে, আমি মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসি। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র মাঝে দুর্বলতা খোঁজার চেষ্টা করার পর এ দাবি করা ভুল যে, তারা মহানবী (সা.)-কেও ভালোবাসে, কেননা তাদের উভয়েই মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন।

হযরত আয়েয বিন আমর (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সালমান, হযরত সুহায়েব ও হযরত বেলাল (রা.) কতিপয় লোকের মাঝে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান আসে। তখন তারা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে আল্লাহ্‌র তরবারির হিসাবনিকাশ এখনও বাকি আছে। অর্থাৎ সঠিকভাবে যে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা

ছিল তা এখনও নেয়া হয় নি। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তোমরা কি কুরাইশের বড় বড় নেতাদের সম্পর্কে এমন কথা বলছ! আবু সুফিয়ানও কুরাইশের সর্দারদের একজন। তোমরা বলছ, আমরা তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেই নি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) নিজে মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু বকর! তুমি হয়ত তাদেরকে, অর্থাৎ সালমান, সুহায়েব ও বেলালকে অসন্তুষ্ট করেছ। আর তুমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাকলে ধরে নিও যে, তুমি তোমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করেছ। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) সেই তিনজনের কাছে এসে বলেন, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা কি আমার কথায় কষ্ট পেয়েছেন? একান্ত ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে তিনি একথা বলেন। তখন তারা বলেন, না, (এটি) এমন কোনো বিষয় নয়। হে আমাদের ভ্রাতা! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। যাহোক, এখানে এটি প্রমাণ করাও উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র বিনয় কী মানের ছিল! তারা এমন লোক যাদেরকে তিনি (রা.) দাসত্ব থেকে মুক্তও করিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের নিকট এসে তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের কী মান ছিল (দেখুন)! মহানবী (সা.) যখন একথা বলেন যে, তুমি (তাদেরকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তিনি (সা.) বলেন নি, যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও। কিন্তু তিনি (রা.) তৎক্ষণাৎ স্বয়ং (তাদের নিকট) যান এবং তাদের কাছে ক্ষমা চান। এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে (এর) ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, এই ঘটনা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কাফিরদের যুদ্ধবিরতির চুক্তির পরের ঘটনা, আবু সুফিয়ান তখনো মুসলমান হয় নি। ওই সময় মুসলামানদের ধারণা ছিল, আমরা তাদেরকে পূর্বেই কেন হত্যা করলাম না!

পবিত্র কুরআন হিফয বা মুখস্থ করা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও ইতিহাসের বরাতে কিছু কথা বলেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আবু উবায়দা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মুহাজের সাহাবীদের মাঝে নিম্নোক্তদের হাফেয হবার বিষয়টি প্রমাণিত:- হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, সা'দ, ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা, সালেম, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ বিন সায়েব, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) আর নারীদের মাঝ থেকে হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.)। এদের অধিকাংশই মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় পবিত্র কুরআন হিফয বা মুখস্থ করে নিয়েছিলেন, আর কতক তাঁর (সা.) তিরোধানের পর মুখস্থ করেন।

'সানিয়াসনাইন' তথা 'দুজনের মাঝে দ্বিতীয়'– এ বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র নিজের রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আনাস হযরত আবু বকরের বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলি আর তখন আমি গুহায় ছিলাম; অর্থাৎ হযরত আবু বকর যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে গুহায় ছিলেন তখন তিনি বলেন, তাদের কেউ যদি তাদের পায়ের নীচে দৃষ্টি দেয়, অর্থাৎ বাইরে অবস্থানরত কাফিরদের কেউ যদি নীচে তাকায় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে পাবে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! সেই দুইজন সম্পর্কে আপনার কী অভিমত যাদের সাথে তৃতীয় সত্তা হলেন আল্লাহ্ তা'লা? এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র গুণাবলী ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি বিশেষ বিষয় হলো, হিজরতের সফরে সঙ্গ দেয়ার জন্য তাঁকে নির্ধারণ করা হয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর বিপদাপদে তিনি

(রা.) তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। আর তাঁকে (রা.) প্রারম্ভিক বিপদাপদের সময় থেকেই মহানবী (সা.)-এর 'আনীস', অর্থাৎ 'বিশেষ বন্ধু' বানানো হয়েছিল যেন খোদার প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে তাঁর (রা.) বিশেষ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। আর এতে রহস্য এটি ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা এটি খুব ভালোভাবে জানতেন, সিদ্দীকে আকবর (রা.) সাহাবীদের মাঝে সবচাইতে বেশি সাহসী, খোদাভীরু এবং মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ও বীরপুরুষ ছিলেন। এছাড়া (আল্লাহ্ তা'লা এটাও জানতেন যে,) তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিভোর ছিলেন। তিনি (রা.), অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) প্রাথমিক যুগ থেকেই মহানবী (সা.)-কে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন এবং তাঁর (সা.) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সামলাতেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা কষ্টদায়ক সময় ও বিপদসঙ্কুল অবস্থায় স্বীয় নবী (সা.)-কে তাঁর (রা.) মাধ্যমে আশ্বস্ত করেন এবং (তাঁকে) 'সিদ্দীক' উপাধি আর উভয় জগতের নবী (সা.)-এর নিকটবর্তীতায় বিশেষত্ব দান করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (রা.) 'সানিয়াসনাইন' (দুজনের মাঝে দ্বিতীয়) হবার গৌরবময় পোশাকে ভূষিত করেন এবং নিজের একান্ত বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

অমুসলিম লেখকেরাও হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন। আলজেরিয়ার বিংশ শতাব্দির একজন ইতিহাসবিদ ছিলেন **আন্দ্রে সার্ভিয়ের**। হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে তিনি লেখেন, আবু বকর সহজ-সরল প্রকৃতির ছিলেন। অভাবনীয় উত্থান সত্ত্বেও তিনি দীনতার সাথে জীবনযাপন করেছেন। মৃত্যুবরণের পর তিনি একটি পুরোনো পোশাক, একজন ক্রীতদাস এবং একটি উট রেখে যান। তিনি আসলে মদীনাবাসীর হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন। তার মাঝে মহান একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আর তা হলো শক্তি ও ক্ষমতা। তিনি লেখেন, মুহাম্মদ (সা.) যে বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছিলেন আর যা তার শত্রুদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য ছিল, সেই গুণ হযরত আবু বকর (রা.)'র মাঝে পাওয়া যেত আর তা ছিল– [অর্থাৎ কী বৈশিষ্ট্য ছিল?] অটল ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস। আর আবু বকর সঠিক স্থানে সঠিক ব্যক্তি ছিলেন। পুনরায় লেখেন, এই বয়োবৃদ্ধ এবং পুণ্যবান ব্যক্তি (তখন) স্বীয় অবস্থানে অটল থাকেন যখন সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজ মু'মিনসুলভ এবং অবিচল সংকল্পের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কার্যক্রমকে নবরূপে আরম্ভ করেন।

আরেক বৃটিশ ঐতিহাসিক **জে. জে সন্ডার্স** লেখেন, প্রথম খলীফার স্মৃতি মুসলমানদের মাঝে সর্বদা এমন এক ব্যক্তি হিসেবে জাগ্রত রয়েছে যিনি পূর্ণ বিশ্বস্ত, দয়া ও অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক এবং কোনো তীব্র থেকে তীব্র ঝড়ও তাঁর স্থায়ী সহনশীলতাকে টলাতে পারে নি। তাঁর শাসনকাল যদিও সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু এতে যে সফলতা অর্জিত হয় তা ছিল মহান। তাঁর প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতা ধর্মত্যাগের ধারাকে নিয়ন্ত্রণে এনে আরব জাতিকে পুনরায় ইসলামের গণ্ডিভুক্ত করে এবং তাঁর সিরিয়া অবরোধের দৃঢ় সংকল্প আরব বিশ্বের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করে।

অতঃপর আরেকজন ইংরেজ লেখক **এইচ. জি ওয়েলস** বলেন, 'এটি বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত রচনায় আবু বকরের ভূমিকা মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে বেশি ছিল, যিনি তাঁর (সা.) বন্ধু এবং সাহায্যকারী ছিলেন।' যদিও তিনি এখানে বাড়িয়ে বলছেন। যাহোক, এরপর তিনি লেখেন, 'মুহাম্মদ (সা.) যদি তাঁর দোদুল্যমান ভূমিকা সত্ত্বেও প্রাথমিক ইসলামের মস্তিষ্ক এবং রূপকার হয়ে থাকেন, (নাঊযুবিল্লাহ্) তাহলে আবু বকর ছিলেন এর (অর্থাৎ ইসলামের) প্রজ্ঞা এবং দৃঢ়তা। যখনই মুহাম্মদ (সা.) দোদুল্যমান হতেন

তখন আবু বকর তাঁর অবলম্বন হয়ে যেতেন।' যাহোক, এসব কথা তার অনর্থক এবং বেহুদা কথাবার্তা যাতে কোনো সত্যতা নেই, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি যে সঠিক কথাগুলো লিখেছেন তা হলো, 'মুহাম্মদ (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন আবু বকর তাঁর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হন এবং পাহাড় টলানো ঈমান নিয়ে তিনি অত্যন্ত সরলতা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তিন অথবা চার হাজার আরব সংবলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনকারী বানানোর কাজ আরম্ভ করেন।'

যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, লেখক হযরত আবু বকরের কতিপয় গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন যা নিঃসন্দেহে তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু যেহেতু তারা মহানবী (সা.)-এর সেই সুউচ্চ এবং সুমহান নবুয়্যতের মর্যাদার প্রকৃত জ্ঞান ও ধারণা রাখত না তাই হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর প্রমুখের প্রশংসায় এতটা অতিশয়োক্তি করে থাকে যা কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। যদিও হযরত উমর হোন বা হযরত আবু বকর, তাঁরা সবাই তাঁদের মনিব ও মহান অনুসরণীয় সত্তা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিশ্বস্ত এবং পূর্ণ আনুগত্যকারী ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি ছিলেন না, বরং সেবকরূপে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য হাত ও পা (স্বরূপ) ছিলেন। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্ম মুহাম্মদ (সা.)-এর মস্তিষ্কের নাম বা কর্ম ছিল না, যেমনটি তিনি লিখেছেন যে, ইসলাম ধর্মের মস্তিষ্ক হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন, নাঊযুবিল্লাহ্, বরং সম্পূর্ণ ঐশী নির্দেশনা এবং আল্লাহ্‌র ওহীর ফলশ্রুতিতে একটি পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গীন শরীয়ত ও ধর্মের নাম ইসলাম। এছাড়া কোনো ধরনের ভীতি বা দোদুল্যমানতার সময় হযরত আবু বকর মহানবী (সা.)-এর অবলম্বন হন নি। বরং প্রথমত মানবের মাঝে সবচেয়ে নির্ভীক, দুঃসাহসী ও বীর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমগ্র জীবনে আমরা কখনো কোনো উৎকণ্ঠা অথবা দোদুল্যমানতা দেখতে পাই না। আর কোনো উৎকণ্ঠা বা আশঙ্কার মুহূর্ত এলেই সর্বশক্তিমান এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী (আল্লাহ্) তাঁর জন্য পৃষ্ঠপোষক হয়ে যেতেন। লেখক লিখেছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে সাহস যোগাতেন, অথচ আমরা একেবারে এর বিপরীত (চিত্র) দেখেছি। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবনে কোনো উৎকণ্ঠা কিংবা বিচলিত অবস্থা দেখা দিলেও মহানবী (সা.) তাঁকে সাহস যোগাতেন। যেমনটি হিজরতের সময় হযরত আবু বকর (রা.) চরম উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও এই উৎকণ্ঠা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় তাঁর জন্যই ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র এহেন উৎকণ্ঠার সময়ে মহানবী (সা.) তাঁকে সাহস যোগান। তিনি (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا। অর্থাৎ হে আবু বকর! তুমি **বিচলিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন**। আর যেমনটি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম আর মহানবী (সা.) আমাকে প্রবোধ দিয়েছেন। অতএব এই একটি ঘটনাই তাঁর (সা.) খোদা-নির্ভরতা এবং আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ নবী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যাহোক, এসব নির্বোধেরা যখন কোনো সত্য স্বীকারে বাধ্য হয় তখন তারা এর মাঝে কিছু না কিছু নোংরামি মিশ্রণের চেষ্টাও অবশ্যই করে।

এরপর যুক্তরাজ্যের আরেকজন প্রাচ্যবিদ **টি. ডব্লিউ আরনল্ড** বলেন, আবু বকর একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন, তার উত্তম নৈতিকতা, মেধা এবং যোগ্যতার কারণে তার স্বজাতি তাকে খুবই সম্মান করতো। ইসলামগ্রহণের পর তিনি তার ধনসম্পদের অনেক বড়

অংশ সেসব মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করার কাজে ব্যয় করেন যাদেরকে কাফিররা তাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষায় ঈমান আনার কারণে দুঃখকষ্ট দিতো।

এরপর স্কটল্যান্ডের একজন প্রাচ্যবিদ এবং ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর **স্যার উইলিয়াম ম্যুর**। তিনি লেখেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকাল সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর পর ইসলাম আবু বকর (রা.)'র চেয়ে আর কারো প্রতি এত বেশি কৃতজ্ঞ নয়। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.)'র চেয়ে বেশি ইসলামের সেবা আর কেউ করে নি।

হযরত আবু বকর (রা.)'র অনুপম নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি কি সত্য নয় যে, বড় বড় শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ্‌রা আবু বকর এবং উমর, বরং হযরত আবু হুরায়রার নাম উচ্চারণের পর অবলীলায় রাযিআল্লাহু আনহু বলে উঠতো আর এই আকাঙ্ক্ষা করতো যে, হায়! আমরা যদি তাদের সেবা করারই সুযোগ পেতাম! কাজেই কে এমন আছে যে বলতে পারে, আবু বকর, উমর এবং আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'লা আনহুম দরিদ্র জীবনযাপন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন? যদিও তারা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের জন্য এক মৃত্যু স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু সেই মৃত্যুই তাদের জীবন সাব্যস্ত হয়েছে এবং কোনো শক্তিই এখন আর তাদেরকে মারতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। তিনি (রা.) আরো বলেন, আবু বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা কেবল এ কারণে আবু বকর বানান নি যে, তিনি কাকতালীয়ভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উমর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এজন্য উমরের মর্যাদা দান করেন নি যে, তিনি ঘটনাচক্রে মহানবী (সা.)-এর যুগে জন্ম নিয়েছিলেন। উসমান এবং আলী (রা.)-কে শুধুমাত্র এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা উসমান ও আলীর সম্মানে ভূষিত করেন নি যে, তারা ঘটনাক্রমে মহানবী (সা.)-এর জামাতা হওয়ার মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন কিংবা তালহা এবং যুবায়েরকে কেবল এ কারণে সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রদান করা হয় নি যে, তারা মহানবী (সা.)-এর বংশধর বা তাঁর স্বজাতির মানুষ ছিলেন আর তাঁর (সা.) যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বরং তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যারা তাদের কুরবানীর মান এমন উচ্চ স্তরে উপনীত করেছিলেন যার চেয়ে উচ্চ স্তরে যাওয়া মানুষের কল্পনাতেও আসে না। অতএব এসব কুরবানীই হলো এমন জিনিস যা মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।

পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে বলেন, আমাদের হৃদয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র কতই না সম্মান রয়েছে! কিন্তু কেউ কি বলতে পারে যে, এই সম্মান তাঁর সন্তানদের কারণে সৃষ্টি হয়েছে? আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যারা জানেও না যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশধারা কতদূর পর্যন্ত চলেছে; কেননা তাঁর বংশধারার তালিকাই সংরক্ষিত নেই। বর্তমানে এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশধর হিসেবে পরিচয় দিয়ে নিজেকে সিদ্দিকী দাবি করে। কিন্তু কেউ যদি তাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা শপথ করে বলো যে, সত্যিকার অর্থেই তুমি সিদ্দিকী আর তোমার বংশধারা (পর্যায়ক্রমে) হযরত আবু বকর (রা.) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে তারা কখনোই কসম খেতে পারবে না; আর তারা যদি কসম খায়ও তবে আমরা বলব, তারা মিথ্যা বলছে আর তারা বেঈমান। এর কারণ হলো, হযরত আবু বকর (রা.)'র বংশধারার হিসাব এতটা সুরক্ষিতই নেই যে, বর্তমানে কেউ নিজেকে সঠিকভাবে তাঁর প্রতি আরোপ করতে পারে। অতএব আমরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সম্মান এজন্য করি না যে, তাঁর বংশধরদের কর্মকাণ্ড

অতি উচ্চ মানের। আমরা হযরত উমর (রা.)-কে সম্মান এজন্য করি না যে, তাঁর বংশধরদের কার্যক্রম খুবই উচ্চ মানের। আমরা হযরত উসমান (রা.)-কে সম্মান এজন্য করি না যে, তাঁর বংশধররা কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড করছে। এছাড়া আমরা হযরত আলী (রা.)-কে এজন্য স্মরণ করি না যে, তাঁর বংশধরদের মাঝে বিশেষ গুণাবলী রয়েছে। হযরত আলী (রা)-এর বংশধারা এখনো পর্যন্ত চলমান রয়েছে কিন্তু তাঁকে এজন্য সম্মান করা হয় না যে, তাঁর বংশধর এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্যান্য যত সাহাবী ছিলেন তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনও এমন নেই যাকে তার পরবর্তী প্রজন্মের কারণে স্মরণ করা হয়। অতএব প্রকৃত বিষয় হলো, আমরা তাদেরকে তাদের ব্যক্তিগত কুরবানী বা আত্মত্যাগের জন্য স্মরণ করি এবং তাঁদেরকে সম্মান করি।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কেই দেখ! তিনি (রা.) মক্কার একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যদি আবির্ভূত না হতেন আর মক্কার ইতিহাস লেখা হতো তবে ইতিহাসবিদ কেবল এতটুকু উল্লেখ করত যে, আবু বকর আরবের একজন অভিজাত ও সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে আবু বকর (রা.) সেই মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন যে, আজ গোটা বিশ্ব সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম নেয়। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর মুসলমানরা যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজেদের খলীফা ও বাদশাহ্ মনোনীত করে তখন এই সংবাদ মক্কাতেও পৌঁছে। (সেখানে) একটি বৈঠকে অনেক মানুষ বসে ছিল, যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন শোনেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে লোকেরা বয়আত করেছে তখন এ বিষয়টি তার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। ফলে তিনি সংবাদদাতাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন্ আবু বকরের কথা বলছ? সে বলে, সেই আবু বকর যিনি আপনার পুত্র। হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফা আরবের এক একটি গোত্রের নাম ধরে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেন, তারাও কি আবু বকরের (হাতে) বয়আত গ্রহণ করেছে? এরপর বড় বড় গোত্রগুলোর নাম ধরে জিজ্ঞেস করেন, তারাও কি আবু বকরের বয়আত গ্রহণ করেছে? সে যখন বলে যে, সবাই একমত হয়ে আবু বকর (রা.)-কে খলীফা ও বাদশাহ্ বানিয়েছে তখন আবু কোহাফা অবলীলায় বলে ওঠেন, **'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'** অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি (আরো) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সত্য রসূল। তিনি (রা.) বলেন, অথচ তিনি অনেক আগে থেকেই মুসলমান ছিলেন। আবু কোহাকা মক্কা বিজয়ের পরে অথবা হয়ত এর পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি যে এই কালেমা পাঠ করেছেন এবং পুনরায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালতের (সত্যতার) ঘোষণা দিয়েছেন সেটির কারণ হলো, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর তার চোখ খুলে যায় আর তিনি বুঝতে পারেন যে, এটি ইসলামের সত্যতার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ; অন্যথায় আমার সন্তানের এমন কী যোগ্যতা ছিল যে, তার হাতে সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে লেখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখুন! তিনি (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন লোকেরা বলতে আরম্ভ করে, (তিনি) মক্কার একজন নেতা ছিলেন, কিন্তু এখন লাঞ্ছিত হয়ে গেলেন। অথচ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে

এরচেয়ে বেশি তাঁর আর কী সম্মান হতে পারত যে, দুইশ' বা তিনশ' মানুষ সম্মানের সাথে তাঁর নাম নিত, কিন্তু ইসলামের কল্যাণ (এত বেশি) যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে খিলাফত ও রাজত্বের কল্যাণে ভূষিত করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাঁকে এক স্থায়ী সম্মান ও অফুরন্ত খ্যাতির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। কোথায় একটি গোত্রের নেতৃত্ব আর কোথায় সমগ্র মুসলিম জাহানের খলীফা এবং আরব দেশগুলোর রাজা হওয়া, যিনি ইরান ও রোমকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরাস্ত করেছেন!

অন্যত্র তিনি (রা.) বলেন, দেখুন! রাজত্ব কেবল মহানবী (সা.)-এরই পদচুম্বন করে নি বরং তাঁর সেবকদেরও পদচুম্বন করেছে। কিন্তু তিনি (সা.) তখনো (রাজত্বের) বাসনা করেন নি যখন তিনি (সা.) রাজত্ব পান নি, আর তখনো (রাজত্বের) বাসনা করে নি যখন তিনি (সা.) রাজত্ব পেয়ে গেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.) রাজত্বের বাসনা করেন নি, হযরত উমর (রা.) রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা করেন নি, হযরত উসমান (রা.)-ও রাজত্বের জন্য লালায়িত ছিলেন না আর হযরত আলী (রা.)-ও রাজত্ব লাভের কামনা করতেন না, বরং তাঁদের মাঝে রাজত্বের কোনো লক্ষণই পাওয়া যেত না। অথচ পৃথিবীতে তাঁরা এমন প্রতাপের অধিকারী রাজা-বাদশাহ্ ছিলেন যার কোনো দৃষ্টান্তই ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের প্রকৃতি এমন অনারম্বরপূর্ণ ছিল, তাদের সাথে সাক্ষাত করা এত সহজ ছিল এবং তাঁদের মধ্যে এত বেশি বিনয় পরিলক্ষিত হত যে, বাহ্যত বুঝার কোনো উপায়ই ছিল না যে, তাঁরা রাজা। তাঁদের কেউই বলেন নি, এটি আমার রাজত্ব আর আমি রাজা। তাঁদের কেউই কখনো নিজেদের রাজা হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং তাঁরা এর বাসনাও করেন নি। বস্তুত যারা খোদার জন্য নিবেদিত হয়ে যান, জগৎ নিজে তাদের পদচুম্বন করে। মানুষ মনে করে, রাজা হওয়ার ফলে তারা সাহায্য পাবে; কিন্তু যারা খোদার জন্য নিবেদিত হয়ে থাকেন রাজ্য মনে করে যে, তাদের সেবা করলে ধন্য হবে।

তিনি (রা.) আরেক স্থানে বলেন, দেখুন! আবু বকর (রা.) রাজা হয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর পিতা মনে করত তাঁর রাজা হওয়া অসম্ভব। কেননা তিনি (রা.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে রাজত্ব লাভ করেছিলেন। এর বিপরীতে তৈমুরও একজন বড় রাজা ছিল। সে তার জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার দরুন রাজা হয়েছিল; নেপোলিয়ানও অনেক বড় রাজা ছিল, কিন্তু সে তার পরিশ্রম ও জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজা হয়েছিল; নাদের শাহ্ও অনেক বড় রাজা ছিল, কিন্তু সে ব্যক্তিগত পরিশ্রম, সাধনা এবং জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে তা পেয়েছিল। অতএব রাজত্ব বা সাম্রাজ্য সবাই পেয়েছে। কিন্তু আমি বলব, তৈমুর মানুষের সাহায্যে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু আবু বকর (রা.) রাজত্ব পেয়েছেন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে। আমি বলব, নেপোলিয়ন জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টায় রাজত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে রাজত্ব পেয়েছেন। আমি বলব, চেঙ্গিস খান জাগতিক উপায় উপকরণের মাধ্যমে রাজত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-কে রাজত্ব দিয়েছেন খোদা তা'লা। আমি বলব, নাদের শাহ্ জাগতিক চেষ্টা প্রচেষ্টার জোরে রাজত্ব পেয়েছিল, অথচ হযরত আলী (রা.)-কে খোদা তা'লা রাজত্ব দিয়েছেন। মোটকথা, রাজত্ব সবাই পেয়েছেন। জাগতিক রাজা-বাদশাহ্রও প্রভাব, প্রতাপ ছিল আর তাদের আইনও প্রয়োগ হতো আর খলীফাদেরও (এসব ছিল)। বরং তাদের আইন প্রয়োগ হতো হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)'র চেয়ে বেশি, কিন্তু এঁরা, অর্থাৎ এই চারজন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাজা মনোনীত হয়েছিলেন আর জাগতিক রাজা-বাদশাহ্রা মানুষের মাধ্যমে রাজত্ব

লাভ করেছিল। অতএব মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সাধারণ কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে না সে কিছু পায় না; [তিনি (রা.) এখানে বিসমিল্লাহ্ পাঠের কল্যাণ বর্ণনা করছেন।] এ কথার অর্থ এই নয় যে, সে তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, বরং এর অর্থ হলো তার এ লক্ষ্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অর্জিত হওয়া সম্ভব না। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যে রাজত্ব লাভ করার কথা ছিল তা হযরত আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী (রা.) লাভ করেছেন; তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ তা পায় নি। অন্যরা যে রাজত্ব পেয়েছে তা শয়তানের কাছ থেকে পেয়েছে অথবা তা মানুষের কাছ থেকে লাভ করা। অন্যথায় **লেনিন, স্টালিন, মালেনকভ** বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে নি, কিন্তু তারা রাজত্ব লাভ করেছে। **রুজভেল্ট, ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ার**ও বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে নি, অথচ তারাও রাজত্ব লাভ করেছে। তারা তো বিসমিল্লাহ্ সম্পর্কে জানতই না আর বিসমিল্লাহ্‌র কোনো মর্যাদাও তাদের হৃদয়ে নেই। অতএব মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা ছাড়া কল্যাণ লাভ করা যায় না তখন এর উদ্দেশ্য ছিল, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কিছুই লাভ করা যায় না। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কেবল সে ব্যক্তিই কল্যাণমণ্ডিত হয় যে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পড়ে নেয়। এখন সবাই এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম যে, খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জিনিস অধিক কল্যাণমণ্ডিত হয় না কি বান্দাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জিনিস অধিক বরকতময় হয়। মানবীয় প্রচেষ্টায় অর্জিত রাজত্বের অবসানও ঘটতে পারে, কিন্তু খোদা তা'লা প্রদত্ত রাজত্বের অবসান ঘটতে পারে না।

হায়! আজ মুসলমানরাও যদি এ বিষয়টি বুঝতে পারত! যদিও তারা বিসমিল্লাহ্ পড়ে তবে মনে হয় যেন তা কেবল বুলিসর্বস্ব, অন্তর থেকে উৎসারিত নয়।

পুনরায় তিনি (রা.) লেখেন, ইয়াযিদও একজন রাজা ছিল, তার কতই না দম্ভ ছিল আর তার ক্ষমতার কতই না দাপট ছিল! সে মহানবী (সা.)-এর বংশ ধ্বংস করেছে। অথচ বাহ্যত সে নিজেকে মুসলমান হিসেবেই দাবি করত। সে তাঁর (সা.) বংশধরদের হত্যা করেছে, কিন্তু তার অনুতাপ ছিল না, বরং সে আরো দম্ভ করত। সে মনে করত, আমার সামনে কথা বলার মত ক্ষমতা কারো নেই। হযরত আবু বকর (রা.)ও দেশের রাজা হন, কিন্তু তাঁর মাঝে নম্রতা ও বিনয় ছিল। তিনি (রা.) বলতেন, খোদা তা'লা আমাকে মানবসেবার উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছেন আর সেবার জন্য যতটুকু সুযোগই আমি লাভ করি তা তাঁর অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে ইয়াযিদ বলত, আমি আমার পিতার কাছ থেকে রাজত্ব পেয়েছি, তাই আমি যাকে ইচ্ছে জীবিত রাখব, যাকে ইচ্ছে মেরে ফেলব। বাহ্যত ইয়াযিদ তার সাম্রাজ্যের দিক থেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র (সাম্রাজ্যের) চেয়ে বড় ছিল। সে বলত, আমি বংশপরম্পরায় রাজা। আমার সামনে কথা বলার মত স্পর্ধা কার আছে? অথচ হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, রাজা হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার কোথায় ছিল? আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা খোদা তা'লাই দিয়েছেন। আমি নিজ ক্ষমতাবলে রাজ হতে পারব না। আমি সবারই সেবক। আমি দরিদ্রেরও সেবক আর ধনীদেরও সেবক। আমার পক্ষ থেকে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে এখনই আমার কাছ থেকে সেটির প্রতিশোধ নিয়ে নাও। কিয়ামতের দিন আমাকে হেয় করো না। হযরত আবু বকর (রা.)'র একথা শুনলে কেউ হয়তো বলবে, এ কী! তাঁর তো একজন গ্রাম্য মাতব্বরের ন্যায় আধিপত্যও নেই। কিন্তু সে ইয়াযিদের কথা শুনে থাকলে বলবে, এগুলো হচ্ছে রোমান ও পারস্য সম্রাটের ন্যায় কথাবার্তা যা ইয়াযিদ বলছে। অথচ হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুবরণের পর তাঁর পুত্র, তাঁর পৌত্র,

তাঁর প্রপৌত্র এবং প্রপৌত্রদের পুত্ররা এবং আরো অগ্রসর হয়ে সেই বংশধর যাদের মাঝে পৌত্র বা প্রপৌত্রের প্রশ্নই ওঠে না– তারাও সর্বদা আবু বকর (রা.)'র বংশধর বলে গর্ব করতো। তাদের কথা বাদ দাও, যারা হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে সম্বন্ধের দাবিদারও নয়, যারা তাঁর (রা.) বংশধরের সাথেও কখনো সাক্ষাৎ করে নি– তারাও যখন আজ তাঁর (রা.) ঘটনাবলী পাঠ করে (তখন) তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে, তাদের ভালোবাসা উদ্বেলিত হয়। কোনো ব্যক্তি তাঁকে মন্দ বললে তাদের রক্ত টগবগ করতে থাকে। মোটকথা নিজ সন্তানসন্ততিরা তো বটেই, অন্যরাও তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রত্যেক কলেমা পাঠকারী যখন তাঁর নাম শোনে তখন (অবলীলায়) বলে ওঠে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'। কিন্তু সেই দাম্ভিক ইয়াযিদ, যে নিজেকে বাদশাহ্‌র পুত্র বাদশাহ্ বলে বলে ক্লান্ত হতো না, সে মৃত্যুবরণ করলে লোকেরা তার পুত্রকে তার স্থলে বাদশাহ্ বানিয়ে দেয়। জুমু'আর দিন এলে তিনি মিম্বরে ওঠেন আর বলেন, হে লোকসকল! আমার দাদা যখন বাদশাহ্ হন তখন বাদশাহ্ হবার মতো তাঁর চেয়েও বেশি যোগ্য লোক বিদ্যমান ছিলেন। আমার পিতা যখন বাদশাহ্ হন তখনো তার চেয়ে অধিক যোগ্য লোক বিদ্যমান ছিলেন। এখন আমাকেও বাদশাহ্ বানিয়ে দেয়া হয়েছে অথচ আমার চেয়ে অধিক যোগ্য লোক (এখনো) রয়েছেন। হে লোকসকল! আমার দ্বারা এই বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। আমার পিতা এবং আমার দাদা (এ পদের অধিক) যোগ্যদের অধিকার হরণ করেছে। কিন্তু আমি তাদের অধিকার হরণ করতে প্রস্তুত নই। তোমাদের খিলাফত এই রইল, যাকে ইচ্ছা দিয়ে দাও। আমি নিজেও এর যোগ্য নই এবং আমার বাপ-দাদাকেও এর জন্য যোগ্য মনে করি না। তারা জোরপূর্বক এবং অন্যায়ভাবে রাজত্ব দখল করেছিল, আমি এর হকদার লোকদেরকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই। একথা বলে তিনি নিজ ঘরে চলে যান। এই ঘটনা শুনেন তাঁর মা বলেন, হে হতভাগা! তুই তোর বাপ-দাদার নাক কেটে এলি? তিনি উত্তরে বলেন, হে আমার মা! আল্লাহ্ যদি তোমাকে বুদ্ধিমত্তা দিতেন তাহলে তুমি বুঝতে পারতে, আমি আমার বাপ-দাদার নাক কাটি নি, বরং আমি তাদের কাটা নাক জুড়ে দিয়েছি (অর্থাৎ সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছি)। এরপর তিনি নিজ ঘরে নির্জনে বসে যান এবং আমৃত্যু ঘর থেকে বের হন নি।

অতএব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে রাজত্ব লাভ হয় সেটির দাবিও পূরণ করা হয়। আমাদের মুসলিম নেতা এবং রাজা-বাদশাহ্‌দের জন্যও এতে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলাম এবং ধর্মের জন্য বিভিন্ন ধরনের কুরবানী করার কারণে আজ হযরত আবু বকর (রা.)'র যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে তা কি জগতের বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌ও অর্জন করতে পেরেছে? আজ পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ্‌দের মাঝে এমন একজনও নেই যে এতটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে যতটা লাভ করেছেন হযরত আবু বকর (রা.)। বরং হযরত আবু বকর (রা.)'র কথা বাদই দিলাম, কোনো বড় থেকে বড় বাদশাহ্‌রও ততটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় নি যতটা (শ্রেষ্ঠত্ব) মুসলমানদের কাছে হযরত আবু বকর (রা.)'র সেবকরা লাভ করেছে। বরং প্রকৃত সত্য হলো, আমাদের কাছে তো হযরত আবু বকর (রা.)'র কুকুরও অনেক সম্মানী ব্যক্তির চেয়ে অধিক প্রিয়। কারণ তিনি (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গৃহের সেবক হয়ে গিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গৃহের সেবক হয়ে গিয়েছেন তাঁর প্রত্যেকটি জিনিসই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে গিয়েছে। এখন এটি সম্ভবই নয় যে, কেউ আমাদের হৃদয় থেকে এই শ্রেষ্ঠত্ব মিটিয়ে দিতে

পারে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, নাউযুবিল্লাহ্ আমরা মহানবী (সা.)-এর অসম্মান করি; অথচ এই হলো আমাদের চিন্তাচেতনা।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র এক পুত্র, যিনি বেশ পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; একবার তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মসজিদে বসে ছিলেন এবং বিভিন্ন কথাবার্তা হচ্ছিল; কথায় কথায় তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা! অমুক যুদ্ধের সময় আমি একটি পাথরের পেছনে লুকিয়ে ছিলাম। আপনি দুইবার আমার সামনে দিয়ে গিয়েছেন। আমি চাইলে তখন আপনাকে হত্যা করতে পারতাম; কিন্তু আমি একথা ভেবে হাত তুলি নি যে, আপনি আমার পিতা। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনে বলেন, আমি তখন তোমাকে দেখতে পাই নি। আমি যদি তোমাকে দেখতে পেতাম তবে অবশ্যই তোমাকে হত্যা করতাম, কারণ তুমি আল্লাহ্‌র শত্রু হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র উন্নত চরিত্র সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আবু বকর (রা.) ছিলেন সেই ব্যক্তি যাঁর প্রকৃতিতে সৌভাগ্যের তেল ও প্রদীপ আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। [অর্থাৎ তাঁর মাঝে জ্বলে ওঠার ও আলোকিত হবার যোগ্যতা ছিল।] তাই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শিক্ষা তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে কোনো তর্ক করেন নি, কোনো নিদর্শন বা মু'জিযা দেখতে চান নি; দাবির কথা শোনার পর শুধু এটুকুই জানতে চেয়েছেন যে, আপনি কি নবুয়্যতের দাবি করছেন? রসূলুল্লাহ্ (সা.) 'হ্যাঁ' বলার সাথে সাথেই তিনি (রা.) বলে ওঠেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি সবার আগে ঈমান আনছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যারা প্রশ্ন উত্থাপন করে তারা খুব কমই হেদায়েত লাভ করে। হ্যাঁ, সুধারণা পোষণকারী ও ধৈর্য ধারণকারীরা পূর্ণরূপে হেদায়েত লাভ করে থাকে। এর উদাহরণ আবু বকর ও আবু জাহল দুজনের মাঝেই রয়েছে। আবু বকর কোনো বিতর্ক করেন নি এবং নিদর্শন দাবি করেন নি, কিন্তু তিনি তা পেয়েছেন যা নিদর্শনপ্রার্থীরা পায় নি। তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখেছেন আর নিজেই এক মহান নিদর্শনে পরিণত হয়েছেন। (পক্ষান্তরে) আবু জাহল তর্ক করেছে এবং বিরোধিতা ও মূর্খতা অবলম্বন করা থেকে বিরত হয় নি। সে নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও (সত্য) দেখার তার সামর্থ্য হয় নি। শেষমেশ নিজেই অন্যদের জন্য নিদর্শনে পরিণত হয়ে বিরোধিতার মাঝেই ধ্বংস হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, মক্কার সেই একই মাটি ছিল যেখান থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এবং আবু জাহলের জন্ম। এটি সেই মক্কাই যেখানে আজ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে সকল শ্রেণি ও স্তরের কোটি কোটি মানুষ একত্রিত হয়। এই দেশেই এদুজন মানুষের জন্ম, যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজের সৌভাগ্য ও ধীশক্তির জন্য হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে সিদ্দীকদের উৎকর্ষ লাভ করেছেন, আর অপরজন দুষ্কৃতি, নিরেট অজ্ঞতা, শত্রুতা ও সত্যের বিরোধিতার কারণে কুখ্যাত। স্মরণ রেখো, উৎকর্ষ দুই প্রকারেরই হয়ে থাকে, একটি হলো রহমান খোদার পক্ষ থেকে এবং অপরটি শয়তানের পক্ষ থেকে। রহমান খোদার পক্ষ থেকে উৎকর্ষ লাভকারী ব্যক্তি ঊর্ধ্বলোকে এক সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন। অনুরূপভাবে শয়তানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উৎকর্ষের অধিকারী ব্যক্তি শয়তানের বংশধরদের মাঝে সুখ্যাতি রাখে। মোটকথা, দুজন একই স্থানে ছিলেন। আল্লাহ্‌র নবী (সা.) কারো মাঝে কোনো পার্থক্য করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা যে নির্দেশই দিয়েছেন সেগুলোর সবই সমানভাবে

সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু হতভাগা ও দুর্ভাগারা বঞ্চিত থেকেছে এবং সৌভাগ্যবানরা হেদায়েত লাভ করে উৎকর্ষের অধিকারী হয়েছেন। আবু জাহল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা অসংখ্য নিদর্শন দেখেছে, ঐশী জ্যোতি ও কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু তাদের কোনোই লাভ হয় নি।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, দেখ! পবিত্র মক্কা নগরীতে যখন মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটে তখন আবু জাহলও মক্কাতেই ছিল এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-ও মক্কারই বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু আবু বকরের প্রকৃতিতে সত্য গ্রহণের সাথে এমন সম্বন্ধ ছিল যে, তখনো তিনি শহরে প্রবেশ করেন নি; (এমতাবস্থায়) পথিমধ্যেই যখন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, নতুন কোনো খবর শোনাও। উত্তর সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) নবুয়্যতের দাবি করেছেন। একথা শুনে তিনি সেখানেই ঈমান আনয়ন করেন এবং কোনো ধরনের মু'জেযা বা নিদর্শন তলব করেন নি; যদিও পরবর্তীতে তিনি অগণিত অলৌকিক নিদর্শন দেখেছেন এবং নিজেও এক নিদর্শন আখ্যায়িত হয়েছেন। কিন্তু আবু জাহল হাজার হাজার নিদর্শন দেখেছে, তা সত্ত্বেও সে বিরোধিতা ও অস্বীকার করা থেকে বিরত হয় নি আর মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যানই করতে থাকে। এতে কী রহস্য বা নিগূঢ় তত্ত্ব ছিল? দুজনের জন্মস্থান একটিই ছিল। একজন সিদ্দীক আখ্যায়িত হন আর অপরজন যাকে আবুল হাকাম বলা হতো সে আবু জাহল আখ্যায়িত হয়। এতে এ রহস্যই অন্তর্হিত ছিল যে, সত্যের সাথে তার প্রকৃতির লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না। আসলে ঈমানী বিষয়াবলী পারস্পরিক সামঞ্জস্যতার ওপর নির্ভর করে। যখন পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন তা নিজেই শিক্ষকে পরিণত হয় এবং সত্য ও সঠিক বিষয়ে শিক্ষা দান করে, আর একারণেই সামঞ্জস্য অর্জনকারী সত্তাও একটি নিদর্শন হয়ে থাকে।

আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, সিদ্দীক, ফারুক এবং উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুম পুণ্যবান ও মু'মিন ছিলেন, আর সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ বেছে নিয়েছেন এবং রহমান খোদার আশিস ও কৃপায় যারা মনোনীত হয়েছেন, আর অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারীরা তাদের গুণাবলীর সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য স্বদেশ ছেড়েছেন, প্রতিটি যুদ্ধের কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন এবং গ্রীষ্মের দুপুরের দাবদাহ এবং শীতের রাতের চরম শীতের পরোয়া করেন নি, বরং উঠতি যুবকের ন্যায় ধর্মের পথে আত্মবিলিন হয়ে পরিচালিত হয়েছেন, আর আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হন নি এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের খাতিরে সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাদের কাজকর্মে সৌরভ এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সুবাস রয়েছে। আর এই সবকিছু তাদের উন্নত পদমর্যাদার বাগান ও তাদের পুণ্যসমূহের ফুলবাগিচার প্রতি নির্দেশ করে আর এর মৃদুমন্দ বাতাস আপন সুরভিত দমকা হাওয়ার মাধ্যমে এর গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে অবগত করে এবং তাদের জ্যোতি পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যের সাথে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদার কসম! আল্লাহ তা'লা শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর ও উমরকে এবং তৃতীয়জন যিনি যুননূরাইন তথা হযরত উসমান– এদের সবাইকে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রসেনা বানিয়েছেন। সুতরাং যে তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন না করে, বরং তাঁদেরকে অবমাননা ও গালমন্দ করতে উদ্যত

হয় এবং তাদের ওপর কটুকথা দ্বারা আক্রমণ করে– আমি এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হওয়ার আশংকা করি। যারা তাঁদের কষ্ট দিয়েছে, অভিসম্পাত করেছে ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, পরিণামে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আর তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়েছে। এটি আমার অনেকবারের অভিজ্ঞতা এবং আমি একথা স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা সকল কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। যে-ই তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না।

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, তোমরা কীভাবে এমন ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করতে পার যাঁর দাবিকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রমাণ করেছেন? [কোনো কোনো ফির্কা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করে;] তিনি (আ.) বলেন, তোমরা কীভাবে এমন ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করতে পার যাঁর দাবিকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রমাণ করেছেন? আর তিনি যখন আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়েছেন তখন আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সমর্থনে নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছেন আর ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন? তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামকে এমন সব বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন যা সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে, আর এমন অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বিষাক্ত সাপকে হত্যা করেছেন, তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে সকল মিথ্যাবাদীকে পরাস্ত ও অকৃতকার্য করেছেন। এছাড়াও হযরত সিদ্দীকের আরো অনেক গুণ ও অবদান রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। চরম সীমালংঘনকারী ছাড়া অন্য কেউই একথা অস্বীকার করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মু'মিনদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী এবং কাফির ও মুরতাদ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আগুনের নির্বাপক বানিয়েছেন এবং এরই পাশাপাশি তিনি তাঁকে কুরআনের প্রথম সুরক্ষাকারী, কুরআনের সেবক ও আল্লাহ্‌র কিতাব 'কিতাবুল মুবীন'-এর প্রচারক বানিয়েছেন। অনুরূপভাবে কুরআন সংকলন ও দয়াময় খোদার প্রিয় রসূল (সা.)-এর কাছ থেকে এর ক্রমবিন্যাসের জ্ঞান লাভের জন্য তিনি নিজের সব চেষ্টা নিয়োজিত করেছেন। এছাড়া ধর্মের শুভাকাঙ্ক্ষায় তাঁর দুনয়ন বহমান ঝর্নার চেয়েও অধিক অশ্রুবর্ষণ করেছে।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অদ্ভুত বিষয় হলো, শিয়ারাও স্বীকার করে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এমন সময়ে ঈমান এনেছিলেন যখন শত্রুর সংখ্যা ছিল অগণিত। তিনি চরম পরীক্ষার যুগে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সঙ্গ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা থেকে বের হয়েছেন তাঁর সাথে হযরত আবু বকরও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে হুযূর (সা.)-এর সাহায্যকারী হিসেবে বের হয়েছেন। সব দুঃখকষ্ট তিনি সহ্য করেছেন আর প্রিয় স্বদেশ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পরিত্যাগ করেছেন এবং সব আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দিয়ে স্নেহশীল প্রভুকে বেছে নিয়েছেন। এছাড়া সব যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং মনোনীত নবী (সা.)-কে সাহায্য করেছেন। এমন সময় তিনি খলীফা মনোনীত হন যখন মুনাফিকদের একটি বড় দল মুরতাদ হয়ে যায় এবং অনেক মিথ্যাবাদী নবুয়্যতের দাবি করে। ফলে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং সন্ত্রাসীরা ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং লড়াই

অব্যাহত রেখেছেন। এরপর তিনি ইহধাম ত্যাগ করার পর নবীকুল শিরোমণি ও নিষ্পাপদের ইমাম মুহাম্মদ (সা.)-এর কবরের পাশে সমাহিত হন। জীবদ্দশায়ও বা মৃত্যুর পরও তিনি আল্লাহ্‌র বন্ধু এবং তাঁর রসূল (সা.) থেকে পৃথক হন নি, বরং অল্প কিছু দিনের বিচ্ছেদের পর আবার উভয়ে মিলিত হয়েছেন এবং ভালোবাসার উপহার উপস্থাপন করেছেন।

অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের (তথা আপত্তিকারীদের) দাবি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর কবরকে দুজন কাফির, আত্মসাৎকারী ও বিশ্বাসঘাতকের গোরস্থানের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন! তিনি তাঁর নবী ও প্রিয় বন্ধুকে এ দুজন, অর্থাৎ আবু বকর ও উমরের পার্শ্বে থাকার যাতনা থেকে পরিত্রাণ দিলেন না বরং তাদের দুজনকে ইহকাল ও পরকালে তাঁর জন্য যন্ত্রণাদায়ক সাথি নিযুক্ত করলেন এবং (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁকে এ দুই নোংরা ব্যক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখলেন না! তারা যা বলে আমাদের প্রভু তাদের বর্ণিত কথা হতে পবিত্র। [তারা যা বলে ভুল বলে; বিষয়টি আসলে এমন নয় যেমনটি বর্ণনা করা হয়।] বরং আল্লাহ্ তা'লা এ উভয় পবিত্রাত্মাকে পবিত্রদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে মিলিত করেছেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

এরপর তিনি (আ.) বিদ্বেষী শিয়াদের সম্পর্কে বলেন, বিদ্বেষী শিয়াদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, অস্বীকারকারী বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সাবালক পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল? তারা বাধ্য হয়ে বলবে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। এরপর যদি প্রশ্ন করা হয়, স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কে সর্বপ্রথম খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর সাথে হিজরত করেছিলেন এবং সেখানে গিয়েছিলেন যেখানে হুযূর (সা.) গিয়েছিলেন? তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। পুনরায় যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় তিনি আত্মসাৎকারী, (নাউযুবিল্লাহ্), যাদেরকে খলীফা বানানো হয়েছিল তাদের মাঝে প্রথম খলীফা কে ছিলেন? এক্ষেত্রেও এ উত্তর দেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উত্তর থাকবে না যে, তিনি ছিলেন আবু বকর (রা.)। পুনরায় যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বিভিন্ন দেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে কে কুরআন সংকলন করেছেন? তারা নির্দ্বিধায় বলবে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও নিষ্পাপদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পাশে কাকে দাফন করা হয়েছে তারা অবশ্যই এ কথা বলতে বাধ্য, তারা আবু বকর এবং উমর (রা.)। তাহলে কী আশ্চর্যের বিষয়! নাউযুবিল্লাহ্, সব ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল মুনাফিক ও কাফিরদের প্রদান করা হয়েছে আর ইসলামের সব কল্যাণ ও বরকত শত্রুদের হাতে প্রকাশিত হয়েছে! একজন মু'মিন কি ভাবতে পারে, ইসলামের সূচনা হয়েছে এমন ব্যক্তির মাধ্যমে যে একজন কাফির ও অভিশপ্ত ছিল? এছাড়া রসূলদের গর্ব মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম যে হিজরত করেছে সে কাফির ও মুরতাদ ছিল! এভাবে এসব কথা মেনে নিলে তো সকল শ্রেষ্ঠত্ব কাফিরদের ঝুলিতেই চলে যায়! এমনকি পুণ্যবানদের সর্দার মুহাম্মদ (সা.)-এর কবরের নৈকট্যও।

আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত কথা হলো, হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর ফারুক (রা.) উভয়ই বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ দুজন অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে কখনোই ত্রুটি করেন নি। তাকওয়ার পথকে তারা জীবনের মূলমন্ত্র আর ন্যায়নীতিকে লক্ষ্য হিসেবে অবলম্বন করেছেন। তারা পরিস্থিতিকে গভীরভাবে

পর্যালোচনা করতেন আর রহস্যের মূল পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন। জাগতিক বাসনা চরিতার্থ করা কখনোই তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা নিজেদের জীবনকে সর্বদা খোদা তা'লার আনুগত্যের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছেন। অসীম কল্যাণ এবং দোজাহানের নবী (সা.)-এর ধর্মের সমর্থনে শায়খাইন [অর্থাৎ আবু বকর ও উমর (রা.)]-এর মত অন্য কাউকে আমি দেখতে পাই নি। মানবকুল ও সকল ধর্মের সূর্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরা উভয়েই চাঁদের তুলনায় অধিক গতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা তাঁর (সা.) ভালোবাসায় বিলীন ছিলেন আর সত্য ও সঠিক পথকে পাওয়ার বাসনায় সব কষ্টকে সুমধুর জ্ঞান করতেন। অনন্য ও অদ্বিতীয় নবী (সা.)-এর জন্য সব লাঞ্ছনাকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। কাফির ও অস্বীকারকারীদের সেনাবাহিনী এবং কাফেলার মোকাবিলায় তারা সিংহের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এভাবে ইসলাম জয়যুক্ত হয়েছে, বিরোধী সেনাদল পরাজিত হয়েছে, শিরক দূরীভূত ও নির্মূল হয়েছে এবং ধর্ম ও সত্য বিশ্বাসের সূর্য প্রদীপ্ত হয়েছে। গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয় ধর্মসেবা করে এবং মুসলমানদের স্কন্ধে অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বোঝা চাপিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে গিয়ে এ দুজনের জীবনের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আল্লাহু আকবর! এই দুজন, অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা কত মহান! এ দুজনই এমন এক কল্যাণমণ্ডিত সমাধিস্থলে দাফন হয়েছেন, মূসা ও ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরা শত চেষ্টা করে হলেও সেখানে সমাধিস্থ হতে চাইতেন। কিন্তু এই পদমর্যাদা কেবল আকাঙ্ক্ষা করলেই পাওয়া যায় না আর শুধু বাসনা করলেই দেওয়া হয় না, বরং এটি হলো, সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে এক চিরস্থায়ী রহমত বা আশিস।

আরো কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ তা আগামীতে উপস্থাপন করা হবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)